উচ্চশিক্ষার সংকট ও শিক্ষার শেকড়ের গল্প

ড. মোহা. হাছানাত আলী
২১ মে ২০২৬, ১২:০০ এএম

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। যমুনা ও পদ্মা সেতুর গর্ব, মেট্রোরেলের গতি, ডিজিটাল রূপান্তরের স্বপ্ন, বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা, অর্থনীতির আকার বৃদ্ধি, ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের মতো যুগান্তকারী জনবান্ধব কর্মসূচির যাত্রা- সবকিছু মিলিয়ে দেশ যেন এক নতুন অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অগ্রযাত্রার অন্তরালে একটি মৌলিক প্রশ্ন ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে- আমাদের শিক্ষার ভিত কতটা মজবুত? যে জাতি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে, সেই জাতির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা যদি দুর্বল হয়, তবে উচ্চশিক্ষার অট্টালিকা কখনই সুদৃঢ় হতে পারে না। কারণ উচ্চশিক্ষা কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; এটি প্রাথমিক শিক্ষার হাত ধরে হাঁটতে শেখা এক দীর্ঘ যাত্রার পরিণতি। একটি শিশুর প্রথম বিদ্যালয় তার পরিবার, দ্বিতীয় বিদ্যালয় তার প্রাথমিক স্কুল। সেখানেই সে শেখে ভাষা, মানবিকতা, কৌতূহল, শৃঙ্খলা, যুক্তি

ও স্বপ্ন দেখতে। সেই ভিত যদি দুর্বল হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার, মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি টেবিল কিংবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক প্রযুক্তি- কিছুই তাকে পূর্ণতা দিতে পারে না। কারণ জ্ঞানের বৃক্ষের শেকড় দুর্বল হলে ফল যতই আকর্ষণীয় হোক, তা টেকসই হয় না।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার বর্তমান সংকট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর একটি বড় কারণ হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত দুর্বলতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বহু শিক্ষার্থী মৌলিক ভাষাগত দক্ষতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, গণিতভীতি দূর করা কিংবা সমালোচনামূলক চিন্তার অভাবে ভোগে। অনেকেই পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষার গণ্ডি পেরোতে পারে না। মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা তাদের সৃজনশীলতাকে সংকুচিত করে দেয়। ফলে উচ্চশিক্ষা হয়ে ওঠে কেবল সনদ অর্জনের প্রতিযোগিতা, জ্ঞানচর্চার মুক্ত ক্ষেত্র নয়। একটি শিশুকে যদি প্রাথমিক পর্যায়ে বই পড়ার আনন্দ শেখানো না হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে গবেষণার প্রতি তার আকর্ষণ তৈরি হয় না। যদি মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানকে কৌতূহলের বিষয় না বানিয়ে কেবল নম্বর পাওয়ার উপকরণে পরিণত করা হয়, তবে উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ তৈরি করা সম্ভব হয় না। যদি বিদ্যালয়ে বিতর্ক, সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ না ঘটে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধে পিছিয়ে পড়ে। আজ দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গবেষণার দুর্বলতা, ভাষাগত সীমাবদ্ধতা, মৌলিক জ্ঞানের ঘাটতি, সেশনজট, বেকারত্ব- সবকিছুর মূলে গিয়ে দেখা যায়, শেকড়ের দুর্বলতা বহু আগেই তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তখন কেবল সেই দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক বিশাল কাঠামো। একটি বিশ্ববিদ্যালয় যত আধুনিক ভবনই নির্মাণ করুক, যত আন্তর্জাতিক চুক্তিই করুক, যদি শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতা দুর্বল হয় তবে প্রকৃত মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষা হলো একটি জাতির আত্মা নির্মাণের প্রথম ধাপ। সেখানে শিশুকে কেবল অক্ষরজ্ঞান দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তাকে শেখাতে হয় কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়, কীভাবে মানুষকে সম্মান করতে হয়, কীভাবে সত্যকে ভালোবাসতে হয়। শিক্ষাকে যদি আনন্দময় করা না যায়, তবে শিশু শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, গ্রামীণ বিদ্যালয়ে এখনও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, শ্রেণিকক্ষ অনুপযুক্ত, প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত, পাঠদান পদ্ধতি একঘেয়ে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শেখার আগ্রহ কমে যায়। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখনও সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন। অথচ একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরির শুরু হয় একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের হাত ধরে। যে শিক্ষক শিশুর মনে প্রথম স্বপ্ন বুনে দেন, তার মর্যাদা যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে জাতির ভবিষ্যৎও দুর্বল হয়ে পড়ে। উন্নত দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি প্রশিক্ষণ ও সম্মান দেওয়া হয়।

একটি দেশের উচ্চশিক্ষার মান কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং দিয়ে বিচার করা যায় না। বিচার করতে হয় সেই বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে কী ধরনের মানুষ তৈরি করছে। তারা কি মানবিক? তারা কি গবেষণামুখী? তারা কি সমাজের সমস্যার সমাধানে কাজ করছে? তারা কি নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ ধারণ করছে? যদি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এসব মূল্যবোধ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়, তবে উচ্চশিক্ষা কখনই পূর্ণতা পায় না।

শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রযুক্তিই শেষ কথা নয়। অনেক সময় দেখা যায়, বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আছে কিন্তু পাঠদানের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়নি। প্রযুক্তি তখন কেবল প্রদর্শনের উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকৃত শিক্ষা তখনই সম্ভব যখন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের দরজা খুলে দিতে পারেন। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মানবিকতা ও সৃজনশীল পাঠদানের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

আজকের পৃথিবীতে উচ্চশিক্ষা মানে শুধু ডিগ্রি নয়; এটি উদ্ভাবন, গবেষণা, প্রযুক্তি ও মানবিক নেতৃত্ব তৈরির প্রক্রিয়া। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ডেটা সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি- সবকিছু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী যদি প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা ও গণিতের ভিত্তি শক্ত করতে না পারে, তবে ভবিষ্যতের এই জটিল জ্ঞানব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

শিক্ষাকে কর্মমুখী করার কথাও আজ বহুল আলোচিত। কিন্তু কর্মমুখী শিক্ষা মানে কেবল কারিগরি দক্ষতা নয়; বরং এমন শিক্ষা, যা মানুষকে সমস্যা সমাধান করতে শেখায়। একটি শিশু যদি ছোটবেলা থেকেই হাতে-কলমে শিক্ষা পায়, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, দলগত কাজ শেখে, তবে ভবিষ্যতে সে আরও দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠবে। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে আনন্দময় করা এখন সময়ের দাবি। একটি শিশু যদি বিদ্যালয়ে যেতে ভয় পায়, তবে শিক্ষা তার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যালয় হতে হবে এমন এক স্থান, যেখানে শিশুরা আনন্দ নিয়ে শিখবে, গান গাইবে, গল্প পড়বে, প্রকৃতিকে জানবে, বন্ধুত্ব করবে। কারণ শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জন নয়; এটি জীবনকে অনুভব করার শিল্প।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, গবেষণা বিনিময় ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন এমন শিক্ষার্থী, যারা সমালোচনামূলক চিন্তা করতে পারে, মৌলিক গবেষণায় আগ্রহী, ভাষাগতভাবে দক্ষ এবং মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। আর এই গুণাবলির শুরু হয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত থেকে।

আজ বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো- আমরা কি কেবল সনদধারী জাতি হতে চাই, নাকি জ্ঞানভিত্তিক মানবিক রাষ্ট্র গড়তে চাই? যদি দ্বিতীয়টি সত্য হয়, তবে আমাদের শিক্ষার ভিত্তি নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। কারণ শিক্ষার শেকড় শুকিয়ে গেলে উন্নয়নের বৃক্ষ দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তার শ্রেণিকক্ষে। সেখানে বসে থাকা ছোট্ট শিশুটিই একদিন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, গবেষক, শিক্ষক, প্রশাসক কিংবা রাষ্ট্রনায়ক হবে। তার হাতে দেশকে তুলে দিতে হলে আজই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

একটি মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয় মানে কেবল একটি ভবন নয়; এটি একটি সভ্যতার সূতিকাগার। একটি মানসম্মত মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানে কেবল পরীক্ষার ফল নয়; এটি একজন নাগরিকের চিন্তার জগৎ নির্মাণের ক্ষেত্র। আর একটি মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় হলো সেই দীর্ঘ যাত্রার পরিণত রূপ। বাংলাদেশ যদি সত্যিকার অর্থে বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা চায়, তবে তাকে প্রথমেই শিশুর হাত শক্ত করে ধরতে হবে। কারণ উচ্চশিক্ষার আলো আসলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রদীপ থেকেই জ্বলে ওঠে। শেকড়কে শক্তিশালী না করে বৃক্ষকে মহীরুহ বানানো যায় না। তাই আজ সময় এসেছে শিক্ষার ভিত্তিকে নতুনভাবে ভাবার- যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা হবে মানবিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সৃজনশীল ও আনন্দময়; আর তার ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠবে এক জ্ঞানভিত্তিক, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক বাংলাদেশ।

প্রফেসর ড. মোহা. হাছানাত আলী : উপাচার্য, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়

মতামত লেখকের নিজস্ব